Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.43-53
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের সেকাল একাল: লোকমাতা নিবেদিতার প্রাসঙ্গিকতা

ড. সঙ্ঘমিত্রা চন্দ
সহকারী অধ্যাপক, রাজনীতি বিভাগ, সিস্টার নিবেদিতা সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়, আলীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

For centuries, in almost every country of the world, women have struggled to establish their own rights in different ways against the patriarchal social system. The precondition for women's empowerment is the establishment of women's rights and, no doubt, education is the main entrance to the establishment of women's rights and women empowerment. Despite being a foreigner, Lokmata Nivedita tried to empower women in the then Indian conservative society by realising their suffering and by educating them. Nivedita's life is so vast in scope and variety that it is beyond the reach of this short research paper to analyse it. It is only possible to achieve a little bit of her way of life with the same respect and love with which Lokmata Nivedita took over the whole of India. In the modern world even today, there are constant researches on the works and devotion of Nivedita. The purpose of this article is, therefore, very limited. This article tries to make a brief attempt to describe her works in terms of a foreigner's vision, her sincere efforts, planning and implementation towards women empowerment in pre-independence India. This article also tries to give a brief review of the steps taken by the government in post-independence India to promote women's education, rights and empowerment and also determine the relevance of Lokmata Nivedita in the empowerment of women in the present Indian society.

Keywords: Child-marriage, Empowerment, Indian Culture, Self-independence, Women's Education

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে । ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন । ভারতবর্ষ এখনো মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।' [i]

\- স্বামী বিবেকানন্দ

জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারার ধারক, বাহক এবং রক্ষয়িত্রী নারীজাতির উন্নতি সাধনে স্বামী বিবেকানন্দ উপরিউক্ত পত্র মারফৎ ১৮৯৭ সালের ২৯ শে জুলাই আলমোড়া থেকে যাঁকে আহ্বান করেছিলেন, সেই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল স্বামীজীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে স্বদেশ স্বজন সব কিছু ছেড়ে ১৮৯৮ সালের ২৮ শে জানুয়ারি এসে পৌঁছলেন তাঁর কর্মভূমি ভারতে।

রক্ষণশীল ভারতবর্ষে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক পরিকাঠামোর কারণে ভারতীয় নারীরাও অন্যদেশের নারীদের মতোই পরাবলম্বী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাসত্ব ও পরাধীনতার গ্লানি ভারতীয় হিন্দুসমাজকে বিভিন্ন ধরনের মধ্যযুগীয় নিয়ম ও কু-প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। আর এই সমস্ত নিয়ম প্রথার জাতাকলে সবচেয়ে বেশি পেশাই হয়েছিল তৎকালীন নারীজাতি। নারী অরক্ষনীয়া, বিবাহই তার একমাত্র বৈদিক সংস্কার। হিন্দুসমাজের কৌলীন্যপ্রথার অপব্যবহার একদিকে অধিকবয়স্ক পুরুষের বহুবিবাহে উৎসাহ দান করে, অন্যদিকে রক্ষণশীল সমাজের অন্ধ গোঁড়ামি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত নারীকে বাল্যবিবাহে বাধ্য করে। ফল - অকাল মাতৃত্ব ও অকাল বৈধব্যের গ্লানি।উঠতে বসতে নারীদের সম্মুখীন হতে হয় সমাজের অতি কঠোর নিয়ন্ত্রনের যা নির্যাতনের নামান্তরমাত্র। পরিস্থিতির চাপে হীনমন্য নারীর শিশু সন্তানসহ বৈধব্যদশায় স্বজনগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন যা আক্ষরিক অর্থে দাসীবৃত্তি অথবা সহমরণ বরণ করে দেবীত্বে উন্নীত হওয়া - উনিশ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত এই ছিল হিন্দুনারীর জীবনালেখ্য। ভারতীয় নারী তথা হিন্দু নারীকে তাদের শত শত বছরের বন্দী দশা থেকে মুক্ত হতে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই সময়কালে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি যে শুধু উপেক্ষিত ছিল তাই নয়, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থাও ছিল তার পরিপন্থী। তখনকার দিনে মানুষদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অসৎচরিত্রা হয়ে যাবে। পরিবারের সকল পুরুষই ছিল তাদের অভিভাবক। পুরুষের রক্তচক্ষু এড়িয়ে কোনো নারীর লেখাপড়া করার প্রয়াস কোনভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা রীতিমত উশৃঙ্খলতা বলে মনে করা হতো।

এমনই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা এবং সংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে এসেই মার্গারেটের পক্ষে তৎকালীন সমাজের কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দূর করা সহজ কাজ ছিল না। পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণার সাথে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শের মিলন, সর্বোপরি মার্গারেটের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে স্বামীজী তাঁর মানসকন্যাকে গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২৫ শে মার্চ দীক্ষান্তে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মানসকন্যা ব্রহ্মচারিনী মার্গারেটকে নিবেদন করেন ভারতমাতার চরণে। মার্গারেটের নবজন্ম হয় নিবেদিতা রূপে। নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর ভারত চিন্তার ভাষ্যকার। নিবেদিতা তাঁর গুরুর চোখ দিয়ে নিপীড়িত ভারতের দৈন্যতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাই তিনি ভারতীয় নারীকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে দিতে হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজীর যোগ্য সহকর্মিনী। স্বামীজীর সান্নিধ্যে নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে, তাঁকে প্রথমে নারীদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেই সমাজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে সমাজের উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট হবেন।

নারী শিক্ষা ও নিবেদিতা: তৎকালীন সময়ে কলিকাতায় নিবেদিতার বিদ্যালয়ের আগে থেকেই ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান ও গোঁড়া হিন্দু পাঠশালাও ছিল। তাহলে প্রশ্ন জাগে নতুন করে আবার বিদ্যালয়ের স্থাপনের কি প্রয়োজন? তৎকালীন বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মিশনারি বিদ্যালয় গুলিতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার চলছিল এবং দেশীয় বিদ্যালয় গুলির মধ্যে কিছু বিদ্যালয় ভারতীয় ভাবধারার উন্নততর দিকগুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাহ্য করছিল আর কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকে শুধু প্রাচীনপন্থী ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। এখানেই ছিল নিবেদিতার চিন্তাধারার পার্থক্য। তাঁর লক্ষ্য আধুনিকতার সাথে প্রাচীনত্বের সমন্বয় সাধন। অবশেষে সেই দিনটি এলো। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর কালী পূজার দিন স্বামীজি ও কয়েকজন গুরু ভাইয়ের উপস্থিতিতে স্বয়ং সারদা মা ১৬নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার স্বপ্নের বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলেন। গুটিকয় বাচ্চা মেয়ে নিয়ে শুরু হলো নিবেদিতার স্বপ্নের পথ চলা। বিদ্যালয়টি ছিল মেয়েদের

আনন্দ নিকেতন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে অভিভাবকদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করে তিনি বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য মেয়েদের নিয়ে আসতেন। বাগবাজারের ছোট ছোট মেয়েরাই সিস্টারের শিক্ষাদাত্রী হয়ে উঠেছিল। তাদের অনেকের কাছ থেকেই তিনি যখন বাংলা শেখার চেষ্টা করতেন তখন সেই শিশুদের নিকটে তিনি বিনীতা ছাত্রীর মত আচরণ করতেন। শুরুতে এই ঘরোয়া স্কুলটিতে কিন্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে গল্পের মতো করে মেয়েদের ভারতের ইতিহাস, ভূগোল পড়ানোর সাথে সাথে আঁকা ও সূচীশিল্প শেখানো হতো। সেসব কাঁচা হাতের কাজের ছোট্ট প্রদর্শনীটি প্রথম বছর উদ্বোধন করেন শ্রীমা স্বয়ং।[ii] বড় মেয়েদের শিক্ষা দেবার ভার ছিল প্রধানত ভগিনী ক্রিস্টিন ও শ্রীমতি সুধীরার উপর। নিবেদিতা যখনই অবসর পেতেন তখনই ছাত্রীদের গনিত ও চিত্রবিদ্যা শেখাতেন। তাঁর শেখাবার প্রণালী ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও নতুন ধরনের। তিনি এমন ভাবে গনিত ও চিত্রবিদ্যা শেখাতেন, তাতে যার শেখার বা বোঝার ক্ষমতা কম, সেও খুব সহজে তা আয়ত্ত করে নিত। নিবেদিতার উপদেশ মেনে বিদ্যালয়ের বড় মেয়েরা ছোট মেয়েদের শিক্ষা দিত। ফলে ক্রমশ মেয়েদের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতে লাগে নিবেদিতার শিক্ষা, শৃঙ্খলাবোধ ও স্বদেশপ্রীতি। আবার অন্যদিকে বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ করে নিবেদিতা বুঝেছিলেন ভারতীয় মেয়েরা ছোট বেলা থেকেই এই দেশের ধর্মাচরণ ও সংস্কার থেকে অনিত্যের মাঝে নিত্যকে আবাহন ও বিসর্জন দেবার শিক্ষা পেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নিবেদিতা: নিবেদিতা শুধু স্কুলেই নয়, স্বামীজীর ইচ্ছায় প্রতি বুধবার বেলুড় মঠের নবদীক্ষিতদের উদ্ভিদবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যার এবং প্রতি শুক্রবার শারীরবৃত্ত ও সূচীশিল্পের শিক্ষা দিতেন। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিতেন। এই সকল বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের ভাইজি ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, কেশবচন্দ্র সেনের দুই কন্যা, জগদীশ চন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবন্যপ্রভা বসু, সরলা ঘোষাল প্রভৃতি শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলারা উপস্থিত থাকতেন। প্রতি শনিবার সকালে ' শিক্ষক-শিক্ষণ' নামে ক্লাস শুরু করেন যেখানে শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলারাই উপস্থিত থাকতেন। পরে এক আমেরিকান মিশনারি স্কুলে তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা করে ইতিহাসের ক্লাস নিতেন।[iii] তৎকালীন সময়ে কলকাতার উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ যেমন তার সান্নিধ্যে এসে আকর্ষিত হন তেমনি সমাজের অতিসাধারণ মেয়েরাও তাকে নিজের পরমাত্মীয়া বলেই মনে করতেন। নিবেদিতা ভালোবেসেছিলেন ভারতীয় নারীদের। সেই সময় ভারতে মেয়েদের অবস্থা ছিল অতি হীন। বিশ্বে তারা করুণা ও অবজ্ঞার পাত্রী। কিন্তু তিনি মেয়েদের প্রতি সামান্যতম কটাক্ষ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও ভাষণে ভারতীয় নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত।

সুন্দর ও সুস্থির সমাজ গড়ার জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ আবশ্যক । নিবেদিতা মনে করতেন মেয়েরাও পারে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে অভিনব ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করতে এবং তাদের উৎপাদনশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজকে ঠাসবুনোটে বেঁধে রাখতে। সংসারে পিতামাতার কর্তব্য সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েই শেষ হয়ে যায় না বরং প্রতিটি ঘরে জাতীয় আদর্শগুলির যথা পারিবারিক জীবনে সংঘবদ্ধতা, দানশীলতা, মর্যাদাবোধ, বীরপূজার রূপায়ণ এবং পুরানকথাগুলির আলোচনা হওয়া উচিত বলে নিবেদিতা আবেদন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন শিশু তার পরিবারের বড়দের থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পায়। জাতীয় চেতনার অর্থ সংঘবদ্ধভাবে নিঃস্বার্থ অভ্যাস করা। শিশু যদি দেখে পরিবারের বড়রা অন্যায়ের প্রশ্রয় না দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন তবে নিজের ঘরেই সে উপযুক্ত জাতিগঠনের শিক্ষা পাবে। একজন বিদেশিনী কর্তৃক সে যুগে বিশ্ব দরবারে ভারতীয় জীবনদর্শন ও নারীর উচ্চ আদর্শ, মহত্ত্বের পরিচয় প্রদানের গুরুত্ব আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনুভব করা কঠিন।

ভারতীয় নারী, আত্মনির্ভরতা ও নিবেদিতা: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে প্রচেষ্টা ভারতের মাটিতে শুরু করেছিলেন স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা নিজের একান্ত উদ্যোগে ভারতীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় তাকে এক অনন্য রূপদান করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের মেয়েরা লেখাপড়া না শিখলে সমাজের প্রকৃত মুক্তি কোনদিন সম্ভব নয়। নিবেদিতা চাইতেন ভারতীয় মেয়েরা শিক্ষিত হবে, কাজ করবে, সাহসী হবে, আবার মেয়েদের সহজাত যে সৌন্দর্যবোধ, তা'ও হারিয়ে ফেলবে না। শুধুমাত্র বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়ে, পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করে যে তিনি স্কুল চালাবার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেছিলেন তাই নয়, স্বামীজির পরামর্শে অর্থের সংস্থান করার জন্য তিনি পাশ্চাত্যেও গিয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাব নিবেদিতার পিছু ছাড়েনি। অর্থের অভাব হলেই খরচ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবনধারণের জন্য বরাদ্দ যৎসামান্য অর্থের থেকেও কাটছাঁট করতেন। যখনই স্কুল দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে গেছে তখনই শিক্ষয়িত্রীর সাথে ছাত্রীদের প্রীতির বন্ধন যেন আরও মজবুত হয়েছে। শিক্ষার কাজে নিবেদিতা যে বাস্তব বাঁধার সম্মুখীন হলেন, তা হল বাল্যবিবাহ। বিবাহের কারণে কুমারী ছাত্রীদের পড়াশুনা মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যেত। শিক্ষিকা ও ছাত্রীর আপত্তি ও মনঃকষ্ট হার মানত সামাজিক অনুশাসনের কাছে। তাই স্বামীজীর পরামর্শে নিবেদিতা জোর দিলেন বাল্যবিধবা ও বিবাহিত মহিলাদের শিক্ষার উপর। নিছক শিক্ষা দানের থেকেও নিবেদিতা তাদের শিক্ষিকা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে তারা নারী শিক্ষা প্রসারে অংশগ্রহণের দ্বারা নারীদের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমশ রক্ষণশীল বাঙালির অন্তঃপুরের দরজা নিবেদিতার জন্য খুলে যায়। এই প্রথম বাঙালি বধূরা স্কুলে এলেন। বালিকাদের সাথে সাথে বাল্যবিধবা ও অন্তপুরবাসিনী বধূরাও সিস্টারের স্কুলে আসতে শুরু করে। তৎকালীন সময়ের গোঁড়া হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরের বয়স্কা মহিলাদের জন্য ১৯০৪ সালে জগদ্ধাত্রীপূজার দিন সিস্টার ক্রিস্টিনের তত্ত্বাবধানে পুরস্ত্রী বিভাগ শুরু হয়। ইতিপূর্বে শুধু যে রক্ষণশীল বাঙালি পরিবার তাদের বিবাহিত মেয়েদের স্কুলে পাঠাতো না এমন নয়, তথাকথিত উদার ব্রাহ্ম পরিবারও তাদের বিবাহিত মেয়েদের স্কুল কলেজে যেতে বাঁধা দিতেন। অথচ সিস্টারের স্কুলে ১৯০৪ সালে বিবাহিত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ষাটজন। শিক্ষার্থীনিরা ছিলেন তখনকার প্রাচীনপন্থী পরিবারের কন্যা ও বধূ। তাই পর্দাপ্রথা অক্ষুন্ন রেখে তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা। নিবেদিতা তাঁর স্কুলের বিবাহিত ও বিধবা মেয়েদের জন্য ফল ও দুধের ব্যবস্থা রাখতেন বিশেষত একাদশীর দিন যাতে ছাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা না ঘটে সেই জন্যই ছিল এই ব্যবস্থা। আজ দেশে সর্বত্র বয়স্কা মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র আছে। নিবেদিতা ছিলেন এই বিষয়ে পথপ্রদর্শিকা। বাইরের জগতের সাথে পরিচিতির জন্য নিবেদিতা ছাত্রীদের মাঝে মধ্যে মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন নিয়ে যেতেন। আবার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দক্ষিনেশ্বর, মায়ের বাড়ি, বেলুড় মঠে নিয়ে যেতেন। নিবেদিতা মনে করতেন চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনকেই শিক্ষা বলা যায়। তিনি লেখাপড়ার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। ১৯০৫ সাল থেকে সেলাই ও অঙ্কনের সাথে মাদুর বোনা প্রভৃতি হাতের কাজ শেখানো হত। [iv]

নিবেদিতা ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশী শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ করা সম্ভব নয়। ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। এদেশের পারিবারিক জীবনের মূলে যে মমতাময়ী স্বার্থশূন্য নারী, তার প্রতি নিবেদিতা নানা ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন না। প্রগতির স্রোত

তখন রক্ষণশীল সমাজেও ক্রমবর্ধমান। তাই বিধবা ও বিবাহিত মেয়েদের বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক, বিজ্ঞান, শিল্পশিক্ষা ও সূচীশিল্প শিক্ষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন।

নারীকে আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেবার পাশাপাশি উপার্জনক্ষম করে তোলার কথা ছিল তৎকালীন নারীপ্রগতি আন্দোলনের মুখপাত্রদের ভাবনারও অতীত। পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি যাতে অর্থকরী শিক্ষা লাভ করে বয়স্কা অসহায় মহিলারা আত্মনির্ভরশীল ও উপার্জনক্ষম হয়ে উঠতে পারেন সেদিকেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অভাবী মেয়েদের দানগ্রহনের গ্লানি থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের দিতেন কোনও না কোনও কাজ। আঠারো থেকে কুড়ি বছরের বিধবাদের সাহায্যে দেশীয় আচার, কাসুন্দী, চাটনী ইত্যাদির ব্যবসায়িক সংগঠন করা এবং ইংল্যান্ড, ভারত ও আমেরিকার বাজারে তার চাহিদা সৃষ্টি করা ছিল নিবেদিতার স্কুলের ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি অংশ। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত স্বদেশী প্রদর্শনীতে নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের তৈরি হস্তশিল্পের বিভিন্ন নমুনা প্রেরন করেন। তিনি তাঁর স্কুলে সুতা কাটার চরকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সকালের প্রার্থনায় বন্দেমাতরম গান অন্তর্ভুক্ত করেন।[v] নিবেদিতার মতে সংস্কৃতির যে কোনও শাখার দুটি স্তর আছে— একটি বিকাশ, অপরটি মুক্তি। যেখানে নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলন ঘটবে— সেখানেই ঘটবে মনের মুক্তি। তিনি মনে করতেন প্রতিটি ভারতীয় শিশুর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হোক তার নিজের কল্যাণের পাশাপাশি তার দে শের কল্যাণ। তাই একজন বিদেশীনি হওয়া সত্ত্বেও, নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি সঞ্চারিত করেছিলেন।

১৯১১ সালের ৭ই অক্টোবর নিবেদিতা উইল করে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দান করে যান ভারতীয় নারীদের শিক্ষা প্রসার ও উন্নতিকল্পে। নিবেদিতার মহানির্বানের পরে পুন্যসলিলা গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ভগিনী নিবেদিতার স্বপ্নের সেই শিশুবৃক্ষটি আজ মহীরুহ তে পরিণত হয়েছে। তাঁর পথের নাম বদলেছে কিন্তু পটের নামটি আজও অপরিবর্তিত। নিবেদিতার মহাপ্রয়াণের পর তাঁর স্বপ্ন থেমে থাকেনি বরং তা এগিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর সহকর্মীগণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং তাঁর প্রানের থেকে প্রিয় ছাত্রীরা।

স্বামী সারদানন্দ প্রকাশিত ১৯১৬-১৮ সালের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়- প্রথম থেকেই নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী বিভাগ ও মাতৃমন্দিরের চারটে উদ্দেশ্য ছিল-

১। শিক্ষা ও সেবাব্রতে যারা জীবন উৎসর্গ করতে চান মাতৃমন্দির তাদের আশ্রমরূপে পরিগনিত হবে।
২। পূর্বোক্ত ব্রতদুটি পালনে আগ্রহী হয়ে যেসব হিন্দুমেয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে চান, আশ্রম তাদের আশ্রয় দিয়ে ওই উচ্চাদর্শে জীবন গঠন করবার এবং সেইসঙ্গে প্রচলিত উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষাকতা ও সেবা কাজ শিখবার সুবিধা দেবে।
৩। কলকাতার দূরবর্তী স্থানের মেয়েরা যারা ওই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে চায়, মাসিক খরচ নিয়ে আশ্রম তাদের সেই সুযোগ দেবে।
৪। সেলাই, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিখিয়ে এবং লেখাপড়া জানলে ভদ্রপরিবারে পড়াবার বন্দোবস্ত করে আশ্রম অসহায় দরিদ্র মেয়েদের জীবিকানির্বাহে সহায়তা করবে।

খুব কম ছাত্রীই মাসিক খরচা দিয়ে ছাত্রীনিবাসে থাকত। সুধীরা ও তার সহকর্মীরা সূচীশিল্প এবং ভদ্রপরিবারে শিক্ষকতা প্রভৃতি নানা উপায়ে দরিদ্র ছাত্রীদের খরচ চালাতেন। নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে সরলা দেবী তার সমস্ত উপার্জন বিদ্যালয়েই দিতেন। (প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা, ১৯৬০)[vi]

ভগিনী সুধীরা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সহায়তায় ১৯১২ সালে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের দুটি শাখা কলকাতার হাতিবাগান ও বালিতে এবং আর একটি শাখা ১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে স্থাপন করেন।[vii] ১৯১৬-১৮ সালের ত্রিবার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়- তখন পর্যন্ত সাতশোর উপরে বালিকা এবং আন্দাজ তিনশো আন্তঃপুরের মহিলা ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতেন। দুশো দরিদ্র মহিলা সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজ শিখে স্বাবলম্বী হয়েছিলেন।[viii]

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র: যেকোন সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের অর্থ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার ক্ষমতায়ন। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আজও নারীর ক্ষমতায়নকে ঘিরে রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেশ কাল নির্বিশেষে ক্ষমতায়নের মূলশর্ত হল শিক্ষা। যথাযথ শিক্ষাই পারে নারীকে ক্ষমতায়িত করতে। তাই প্রথাগত শিক্ষালাভের জন্য মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারী হল জাতীয় জনসম্পদের প্রায় অর্ধেক এবং জাতীয় অগ্রগতিতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে যেমন সংবিধান নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছে তেমনি বিভিন্ন কমিশন কমিটি মেয়েদের ক্ষমতায়নে নারী শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকার করে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের দিকে জোর দিয়েছে।

যুগ যুগ ধরে প্রায় প্রতিটি দেশেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নারীদেরই তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইটা লড়তে হয়েছে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। শিক্ষাই অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা ক্ষমতায়নের মূল প্রবেশপথ। শিক্ষা মানুষের মধ্যে সার্বিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। মেয়েদের পক্ষে আইনি অধিকারের সংখ্যা আজও সীমিত। ফলে অক্ষর জ্ঞানহীন নারীদের পক্ষে সেইসব অধিকারগুলো যথাযথ ভাবে ব্যবহারের পরিসর আরো সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষা আত্ম ও সমাজ সচেতন নারীর মধ্যে সহজেই আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত আত্মবিশ্বাসী নারীর প্রতি পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং সর্বক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অধিকারহীনতা ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা মেয়েদের জীবনে এক বড় অভিশাপ। অর্থনৈতিক সমস্যা নারীকে অন্যান্য অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই নারী তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। একজন স্বাবলম্বী নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শুধু তার জীবনকেই সুরক্ষিত করেনা বরং তাকে অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। একজন উপার্জনশীল নারী সর্বক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও মান-মর্যাদা আদায় করে নিতে পারেন। স্বাবলম্বী শিক্ষিত নারী অতি সহজেই পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে জোরালো করে তুলতে পারে। আত্মপ্রত্যয়ী শিক্ষিত নারী বিবাহ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার লাভ করে। একজন শিক্ষিত নারীর স্বাভাবিক সচেতনতা এবং অধিকারবোধ বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে পরিবার নিয়ন্ত্রণে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত নারী জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ায় ঘন ঘন সন্তান ধারণের হাত থেকে মেয়েরা নিষ্কৃতি লাভ করে এবং সেই সময়ের যোগ্য ব্যবহার করে উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কর্মকান্ডে নিজেদের নিযুক্ত করে আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করতে পারেন। একজন শিক্ষিত সচেতন মা সন্তানের জন্ম, পুষ্টি এবং নিজের জীবনের সুরক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ থাকার কারণে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর ও শিশু মৃত্যুর সম্ভাবনা হ্রাস পায়। একজন মায়ের শিক্ষার সাথে শিশুর শিক্ষা ওতপ্রোত

ভাবে জড়িত। যেহেতু মা তার সন্তানকে কোলে পিঠে করে বড় করে তোলে তাই শিশুর প্রাথমিক সামাজিকীকরণ, প্রথাহীন শিক্ষা ও মূল্যবোধ গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষিত ও সচেতন মায়েরা শুধু সন্তানের শিক্ষা নয়, সন্তানের তথা পরিবারের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, চাহিদা ও অন্যান্য বিষয়ে অধিক যত্নশীল হন। ভারতীয় সংবিধান নাগরিকের ভোটাধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাথে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় নারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছে। একজন শিক্ষিত আত্মবিশ্বাসী নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং একজন অক্ষর বঞ্চিত নারীর তুলনার সহজেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার থেকে শুরু করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

যেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের সাথে যুক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রই একে অপরকে প্রভাবিত করে তাই ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার, সামাজিক রক্ষণশীলতা, মেয়েদের প্রতি পরিবারের অবহেলা, নারী পুরুষ বৈষম্য, তুলনামূলকভাবে মেয়েদের জন্য কম অর্থবরাদ্দ, নারীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, পাঠ্যসূচিতে পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব, নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর অভাব, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, গোষ্ঠী ও সামাজিক সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, কাজের জগতে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থানের অভাব আজও ভারতীয় নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ক্ষমতায়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়ে আছে।

বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের পরবর্তী সময়কাল থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ভারত সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। ১৯৮৫ সালে সরকার মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ মন্ত্রকের অধীনে পৃথক 'মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ' গঠন করে যা ২০০৬ সালে পূর্ণ মন্ত্রকের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯২ সালে গঠিত হয় জাতীয় মহিলা কমিশন। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রকল্প মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহনের হার বৃদ্ধি করে তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করছে তথাপি বাস্তবে সরকারি সুযোগ সুবিধা ও বিভিন্ন প্রকল্পের সুফলের সিংহভাগই এখনও পর্যন্ত সঠিক ভাবে দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের কাছে পৌঁছয় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য আছে সর্ব শিক্ষা অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, লাডলী লক্ষ্মী, কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প। নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার গ্রহণ করেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, সবলা, সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা, প্রসূতি মৃত্যু পর্যালোচনা, খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদির ন্যায় কর্মসূচি। মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে গৃহীত হয়েছে স্বলম্বন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, সুকন্যা সমৃদ্ধি , মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীণ রোজগার যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্মসূচীর মত আরো অনেক প্রকল্প। রাষ্ট্র নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করছে জাতীয় মহিলা কমিশন, ফৌজদারি বিধি (সংশোধন) আইন ২০১৩, যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের রক্ষা আইন(২০১২), গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারীদের রক্ষা আইন (২০০৫), বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন(২০০৬), মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদির ন্যায় বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান নারী পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করলেও আজও বাস্তবে নারী পুরুষের তুলনায় সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নারীকে আজও হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়। পরিবারের সকল প্রয়োজনে সে তার শ্রম, অর্থ ব্যয় করেও অধিকাংশ সময় প্রাপ্য সম্মান টুকুও পায় না। শুধু তাই নয় দৈনন্দিন জীবনে পারিবারিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে পুরুষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। দুঃখের কথা হল ভারতবর্ষে এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের

অংশগ্রহণ তথা ক্ষমতায়ন বহুলাংশে কম। যদিও স্থানীয় সরকারগুলিতে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষন করা হয়েছে তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মহিলার বাড়ির পুরুষেরা বা মহিলা যে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত সেইদলের পুরুষ নেতারাই তাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও নারী পুরুষের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও স্বাধীনতার পর মেয়েদের শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও সরকারী তথ্য অনুযায়ী জাতীয় ও রাজ্য স্তরে মেয়েদের স্বাক্ষরতার হার আজও পুরুষের তুলনায় অনেকটাই কম। বিভিন্ন সমীক্ষা, গবেষণা ও সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় যে ভারতের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম রাজ্য যেখানে ১৫-১৯ বছরের বালিকাদের বাল্যবিবাহের হার ২৫.৬% যা জাতীয় গড় বাল্যবিবাহের হারের (১১.৯%) থেকে অনেকটাই বেশী। ২০১৫-১৬ সালের ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে ৪৭% মেয়েকেই কমপক্ষে একটি সন্তানের জন্ম দিতে দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১২ বা তার নীচের বয়স থেকে ১৯বছর বয়স পর্যন্ত যেই সমস্ত বিবাহিত কিশোরী মায়েরা প্রথম বাচ্চার জন্ম দেন তার শতকরা হার যথাক্রমে ০.২%, ০.৩%, ৫.১%, ১০.৬%, ২১.৪%, ২৯.৫%, ২৩.৫%, ৯.৪%।[i x] বাল্যবিবাহ হলো গভীরভাবে ভেঙে পড়া এক অসম সমাজের লক্ষণ। এখন শিশু ও নারী পাচারের অন্যতম হাতিয়ার বাল্যবিবাহ। কখনো কখনো এই কাজ পরিবারের জ্ঞাতার্থে হয়ে থাকে। দারিদ্র্যতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে অভিভাবকরা শিশু বা কিশোরী কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে কার্যত বিক্রি করে দেন। । ভারতীয় নারী সমাজের স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্রটিও অসন্তোষজনক। বিভিন্ন সমীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে ভারতে মাতৃ মৃত্যুর হার ও শিশু মৃত্যুর হার ক্রমশ কমছে তবুও প্রতিবছর হাজার হাজার মা ও নবজাতক শিশুর মৃত্যু হচ্ছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। যদিও স্বাধীনতার পর মেয়েদের ক্ষমতায়ন হয়েছে তবুও কর্মক্ষেত্রে বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে সীমিত প্রবেশাধিকার, নিরাপত্তাহীনতা, লাঞ্ছনা এবং বেতনের বৈষম্য আজও তাদের পিছু ছাড়েনি। তাই আজও ভারতের সব শ্রেণী কাঠামোয় মহিলাদের ঠাই তলানিতে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নিবেদিতার প্রাসঙ্গিকতা: বর্তমান সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে কিছু পরিমাণ অর্থ তাদের হাতে তুলে দেন যাতে তারা নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে স্বাবলম্বী হতে পারে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা অসম্পূর্ন থেকে যাবে যদি মেয়েদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা তথা বাজার তৈরি না করা যায়। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বা বাজারের কথা মাথায় রেখেই বর্তমানে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মেয়েদের প্রশিক্ষণ গুলি দেওয়া হয়। সেই জন্য সরকার মেয়েদের সাহায্যার্থে, মেয়েদের নিয়ে স্বনির্ভরগোষ্ঠী গড়ে তোলে। মহিলাদের স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলির উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রির করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেলা সংগঠিত করা হয়। এই মেলা গুলির অন্যতম লক্ষ্য হলো স্বনির্ভরগোষ্ঠী গুলির দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রির বাজার তৈরি করা। প্রবন্ধের উপরের অংশ গুলি স্মরণ করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বাজার তৈরি করার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েদের শুধু পুঁথিগত শিক্ষা দিয়ে নয় তার সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেবারও প্রয়োজন আছে যাতে তারা প্রয়োজনে স্বাবলম্বী হতে পারে। কারণ পুঁথিগত শিক্ষা যেমন মেয়েদের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটিয়ে পুরুষদের সাথে সবদিকে তাল মিলিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে তেমনি বৃত্তিমূলক শিক্ষা আর্থিক দিক থেকে মেয়েদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। আজ স্বাধীনোত্তর ভারতে সরকারী সাহায্যে শিশুদের প্রিস্কুল শিক্ষার সাথে পুষ্টির অভাব মেটাবার জন্য খাবার

দেওয়া হয়। নিবেদিতাও তাঁর স্কুলে দরিদ্র বিধবা ও বধূদের খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছাত্রীরা স্কুলে উপস্থিত না থাকলে তিনি তাদের খোঁজ নিতে যেতেন বাড়ীতে। ছাত্রীদের লেখাপড়া, হাতের কাজ ও দৈনন্দিন কাজের ভিত্তিতে উৎকর্ষপত্র তৈরি করতেন। মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা জাগাবার জন্য তিনি একটি পথ গ্রহণ করেছিলেন। আজ থেকে প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে কলকাতার ঐ অবরুদ্ধ পল্লীতে, ১৭নং বোসপাড়া লেন, মহিলা সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। বাংলার ৯ই কার্তিক, ইংরেজি 2 6 শে অক্টোবর বোসপাড়া লেনে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহযোগিতায়।[X] আজ স্বাধীন ভারতে অভাবী শিশু, বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষা, পুষ্টি, ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'মহিলা ও শিশু উন্নয়ন' মন্ত্রকের অধীনে রাষ্ট্র নেতারা, পদস্থ আধিকারিকগন, রাজ কর্মচারীগণ, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে যে সুবিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন তা একা একজন বিদেশিনী নারী পরাধীন ভারতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ছোট পরিসরে বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন, যা এক কথায় অভাবনীয়।

নারী মুক্তি ও নারী প্রগতির সম্পর্কে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি তাঁর গুরুর দেখানো পথে চলে যেমন ব্যবহারিক জগতে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও নারী পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদ করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন সব ধরনের সমস্যার সমাধান শিক্ষার মাধ্যমে করা সম্ভব। তবে সেই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়, তার আলোয় নারীর মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটবে। মেয়েরা আত্মজ্ঞানের অধিকারী এবং স্বনির্ভর হবে। নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বদিক থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মেয়েরা স্বাধীনভাবেই নিজেদের সব ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। ক্ষমতা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষে কোনও ভেদ নেই। উৎসাহ, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ পেলে উভয়েই সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

উপসংহার: মহিলাদের ক্ষমতায়ন এক অবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি। যদিও নারীদের স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় বর্তমানে জাতীয় নীতিতে স্থান পেয়েছে এবং তৎসম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে তথাপি বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতার স্বপ্নের ভারতে আজও ভ্রূণহত্যা, বাল্যবিবাহ, নারীপাচার, নারী নির্যাতন, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দিন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের কথা স্মরণ করলে দেখা যাবে, ব্রাহ্ম নেতাদের সাধু উদ্দেশ্য ও চিন্তা থাকলেও তারা যথার্থ স্ত্রীস্বাধীনতা চাননি। তারা চেয়েছিলেন ভারতীয় নারী হবে তদানীন্তন পাশ্চাত্যদেশীয় নারীর প্রতিরূপ মাত্র যাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার, আত্মনির্ভরতা, যথেচ্ছাচার থাকবে না। কিন্তু এই কি প্রকৃত স্বাধীনতা? নারীকে যদি পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয় তবে তার জন্য স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে কি হবে? কিন্তু স্বামীজী চেয়েছিলেন মেয়েদের শৃঙ্খলমুক্তি ও সর্বাঙ্গীন অভ্যুদয়। আর তিনি তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সঞ্চারিত করেছিলেন। ভারতীয় নারীকে তিনি যথার্থ স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি মনে করতেন শুধু শিক্ষাসম্বন্ধীয় কাজে বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরুষেরা মেয়েদের কিছুটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু নারীর মৌল সমস্যার প্রকৃতি নিরুপণ করে সমাধানের দায়িত্ব পুরুষের না নেওয়াই উচিৎ, মেয়েরা তাদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়বে। স্বামীজী স্পষ্ট বলেছিলেন ' পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে , তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার

গ্রহণ করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। একটি প্রারম্ভিক ভুল লইয়া আমি কাজ শুরু করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং শেষ অবধি এত বৃহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহা হইলে নারীরা কখনও ঐ নির্ভরতার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না - উহাই প্রথা হইয়া দাড়াইবে।' (বাণী ও রচনা, ১০। ১৭৫)। এই একটি বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যত ভারত সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতখানি স্বচ্ছ ছিল। আমার মনে হয় এক জনগোষ্ঠীকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা থাকে মেয়েদের। আদিকাল থেকে আমরা নারীকে দেবী জ্ঞানে পূজো করে আসছি। একই অঙ্গে নারীর অনেক রূপ। মেয়েরা নিজেদের পরিবারকে যেমন থিতু দেখতে চায় তেমনি তারা প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদেরকে যে কোন ছাঁচে ঢেলে হয়ে উঠতে পারে স্রষ্টা ও সংরক্ষক। তাই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে নারীকেই প্রধান এবং একমাত্র ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অন্যের হাতের দম দেওয়া পুতুল না হয়ে সেই হবে স্বয়ংসম্পূর্ন চালক।

প্রবন্ধের উপরের অংশগুলি স্মরণ করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, স্নেহময়ী মা যেমন দিনরাত তার সন্তানের কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে থাকেন, একজন বিদেশিনী হয়েও নিবেদিতা সেভাবেই তাঁর স্নেহদৃষ্টি দিয়ে ভারতের সমাজজীবনের প্রতিটি দিক পূর্ণ করে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মত্যাগমূলক তপস্যার জীবন। তবে আজ একথা বলার সময় এসেছে, আমরা নিবেদিতাকে যে ভাবে বিস্মৃত হয়েছি, তা বিস্ময়কর! যিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভারত চিন্তার ভাষ্যকার, তাঁকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষাক্ষেত্রে তো নয়ই, জীবনের অন্য কোনও অন্ধকার ঘোচানোর কাজেও স্মরণ করিনি। এ আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা শুধু তাঁর নামে কিছু মূল্যহীন আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছি। নিজেদের জীবনচর্যায় আজও আমরা তাঁর বাণী ও আত্মত্যাগকে প্রয়োগ করার কোন চেষ্টাই করিনা। আমাদের কর্তব্য নিবেদিতার শিক্ষাদর্শ ও সেবাকে জনজীবনের সজীবতায় স্থাপন করা। ঐতিহ্য ঘোষণা বা ফলক লাগানো কিন্তু যথেষ্ট নয়। অতীতের কীর্তিকে যদি বর্তমানে সজীব করে তুলতে হয় তবে স্মৃতির সাথে বর্তমান জীবনযাত্রার যোগ সাধন করতে হবে।

তথ্যপঞ্জী :

১ বসু, শঙ্করীপ্রসাদ. (১৯৬৮). *নিবেদিতা লোকমাতা* (প্রথম খণ্ড). আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.পৃষ্ঠা-৬-৭

২ প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা.(১৯৬০). নারীজাগরণ ও শ্রীশ্রীমা. প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা(সম্পাদিকা), *জন্মজন্মান্তরের মা (*পৃষ্ঠা-১০৬). উদ্বোধন কার্যালয়

৩ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা.(২০১৭). *ভগিনী নিবেদিতা* (দশম সংস্করণ). রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল. পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬

৪ প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা. (১৯৬০). নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 'মাতৃমন্দির' ও শ্রীশ্রীমা. প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা(সম্পাদিকা), *জন্মজন্মান্তরের মা* (পৃষ্ঠা ১১৯). উদ্বোধন কার্যালয়

৫ Basak, Sudeshna. (1992). *Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century*, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 53, pp. 414-422. https://www.jstor.org/stable/44142819

৬ প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা. (১৯৬০). নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 'মাতৃমন্দির' ও শ্রীশ্রীমা. প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা(সম্পাদিকা), *জন্মজন্মান্তরের মা* (পৃষ্ঠা ১২১). উদ্বোধন কার্যালয়

৭ প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা. (১৯৬০). নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 'মাতৃমন্দির' ও শ্রীশ্রীমা. প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা(সম্পাদিকা), *জন্মজন্মান্তরের মা* (পৃষ্ঠা ১২১). উদ্বোধন কার্যালয়

[৮] প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা. (১৯৬০). নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 'মাতৃমন্দির' ও শ্রীশ্রীমা. প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা(সম্পাদিকা), *জন্মজন্মান্তরের মা* (পৃষ্ঠা ১২৪). উদ্বোধন কার্যালয়

[৯] Young Lives Research to Policy Centre. (2016). *WEST BENGAL CHILD MARRIAGE AND TEENAGE PREGNANCY: AGE GROUP 15-19 YEARS,* pp.4. https://www.younglives-india.org/sites/www.younglives-india.org/files/201903/NFHS%20West%20Bengal%20Factsheet_Eng%236.pdf

[১০] গুপ্ত ,অনীতা. (২০১২). সিস্টার নিবেদিতা ও তৎকালীন বাঙালি মহিলা সমাজ. *পৈতি* (পৃষ্ঠা-১৭-২৬). রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন।

গ্রন্থপঞ্জী :

১. প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, প্রব্রাজিকা সদাত্বপ্রাণা (সম্পাদিকা). (১৯৯৮).*নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা ১৮৯৮-১৯৯৮*.রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল

২. The Master as I saw him – Sister Nivedita, উদ্বোধন কার্যালয়

৩. Advaita Ashrama (1996). *The Complete Works of Sister Nivedita: Vol. 4*(3rd Impression)

৪. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ. (১৯৬৮). *নিবেদিতা লোকমাতা* (প্রথম খণ্ড). আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫. রেমঁ, লিজেল (অনুবাদক নারায়ণী দেবী). (২০২০). *ভারতকন্যা নিবেদিতা* (চতুর্থ মুদ্রণ). শ্রী অনির্বাণ বিশ্ব সারস্বত সমাজ

৬. Pravrajika Atmaprana. (2017). *Sister Nivedita* (8th Ed). Sister Nivedita Girls' School

৭. সরকার, সরলাবালা. (২০১৭). *নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি* (ঊনবিংশ সংস্করণ). রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল

৮. Som, R. (2017). *Margot: Sister Nivedita of Swami Vivekananda*. Penguin Random House India Private Limited

৯. কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক. (২০১৬). *যোজনা : ধনধান্যে*, কলকাতা

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিত. (January 2015). বিবেকানন্দের চেতনায় নারী : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে. *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS).* I (IV), 1-7. http://www.ijhsss.com